নভেম্বর মাসের ১৪ তারিখটি, অর্থাৎ পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর জন্মদিনটি, ভারতে শিশুদিবস হিসাবে পালিত হয়। ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ এই দেশে বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্যের সন্ধান পেয়েছিলেন। কিন্তু আজকে ভারতের নিজস্ব সংস্কৃতি কি প্রকৃত অর্থে বর্তমান প্রজন্মের শিশুদের মধ্যে প্রতিফলিত হচ্ছে? নাকি বিদেশী সংস্কৃতির অনুকরণের নেশায় ভারতের আগামী প্রজন্ম বুঁদ হয়ে আছে? এইভাবে চলতে থাকলে তারা কি ভারতীয় সংস্কৃতিকে ধরে রাখতে পারবে?

গুঞ্জন

গুঞ্জন
গুঞ্জন
গুঞ্জন
গুঞ্জন

মাসিক ই-পত্রিকা

বর্ষ ৪, সংখ্যা ৬

নভেম্বর ২০২২

মিশ্র সংখ্যা

কলম হাতে

ডাঃ অমিত চৌধুরী, শান্তিপদ চক্রবর্ত্তী, মৌ বিশ্বাস, সুধীর বরণ মাঝি, প্রসূন কান্তি ভট্টাচার্য্য, অনির্বাণ বিশ্বাস, এবং পাণ্ডুলিপির অন্যান্য সদস্যরা...

প্রকাশনা

পাণ্ডুলিপি (গল্প, কবিতা, গান, গদ্য ও নাটকের আসর)

বি.দ্র.: লিটল ম্যাগাজিন হিসাবে মুদ্রিত এই পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশ হয় ইং ১৯৭৭ সালে...

@Pandulipi

যোগাযোগের ই-মেলঃ contactpandulipi@gmail.com

পায়ে পায়ে

সাহিত্য ও সংস্কৃতি উভয়ের মধ্যে একটা অপূর্ব মেলবন্ধন আছে। শুধু সংস্কৃতি বললে ভুল হবে, সমাজ জীবনের এক বাস্তবিক দর্পণ হল সাহিত্য। তবে আজকের আলোচনার বিষয় কিন্তু সাহিত্যের চুলচেরা বিশ্লেষণ নয়। বরং সমাজ জীবনের অলিগলি কীভাবে সাহিত্যকে রসদ দান করেছে — সে বিষয়টি নিয়েই আজকের চর্চা। চর্যাপদ থেকে শুরু করে আধুনিক সাহিত্য রচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল সমাজ-জীবন। আবার অঞ্চলভেদে এই সমাজ ও সংস্কৃতি ভিন্ন রকমের হয়। এক-একটি অঞ্চলের ভাষার যেমন একটি মহিমা আছে, তেমনই জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতিরও বিশিষ্ট গরিমা বর্তমান। আর এই আঞ্চলিক উপাদানগুলি যদি লেখার মোক্ষম স্বাদ হিসাবে সংযোজিত হয়, তাহলে সেই সাহিত্য কর্ম নিখুঁত ও উত্তম সৃষ্টি হিসাবে পরিগণিত হয়।

তাই বর্তমান লেখনীর মধ্যেও সেই আঞ্চলিক ও সামাজিক নিখুঁত ছোঁয়া অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়। আমাদের গুণী লেখক ও লেখিকাদের কাছে বিশেষ আবেদন এই যে, তাঁরাও যেন নিজ নিজ অঞ্চলের সমাজ ও সংস্কৃতিকে লেখার মাধ্যমে গুঞ্জনের পাতায় সাজিয়ে তোলেন। হোক না একটু ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে নতুন ধরনের সৃষ্টি। ■

বিনীতাঃ রাজশ্রী দত্ত (নীলাঞ্জনা), সম্পাদিকা, গুঞ্জন

বিনীতঃ প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পিকে), নির্বাহী সম্পাদক, গুঞ্জন

কলম হাতে

হস্তাঙ্কন

ছবির নামঃ দীঘার ঝাউবন...

শিল্পীঃ রিত্বিকা চ্যাটার্জি ✧ বয়সঃ ১৩ বছর

সবাই জানাবেন এই উদীয়মান শিল্পীর ছবিটি কেমন লাগল...

নদীটি বলেছিল

মৌ বিশ্বাস

কান্না জমানো ক্যান্সারের মতো রোগ,
আমি নিজেও তো জেনেছি,
যখন নদীটি বলেছিল -
সে আমার কাছের মানুষ হোক।

আমি রাতভর কান্নাতে ভিজে গেছি,
তবু সে মুছে দেয়নি তো চোখ।
সেই নদীটি বলেছিল -
সে আমার কাছের মানুষ হোক।

আমি দুঃখ নিয়ে বালিশে, বিছানাতে,
পাশে শুয়ে থাকে শোক।
তবু নদীতে বলেছিল -
সে আমার কাছের মানুষ হোক। ■
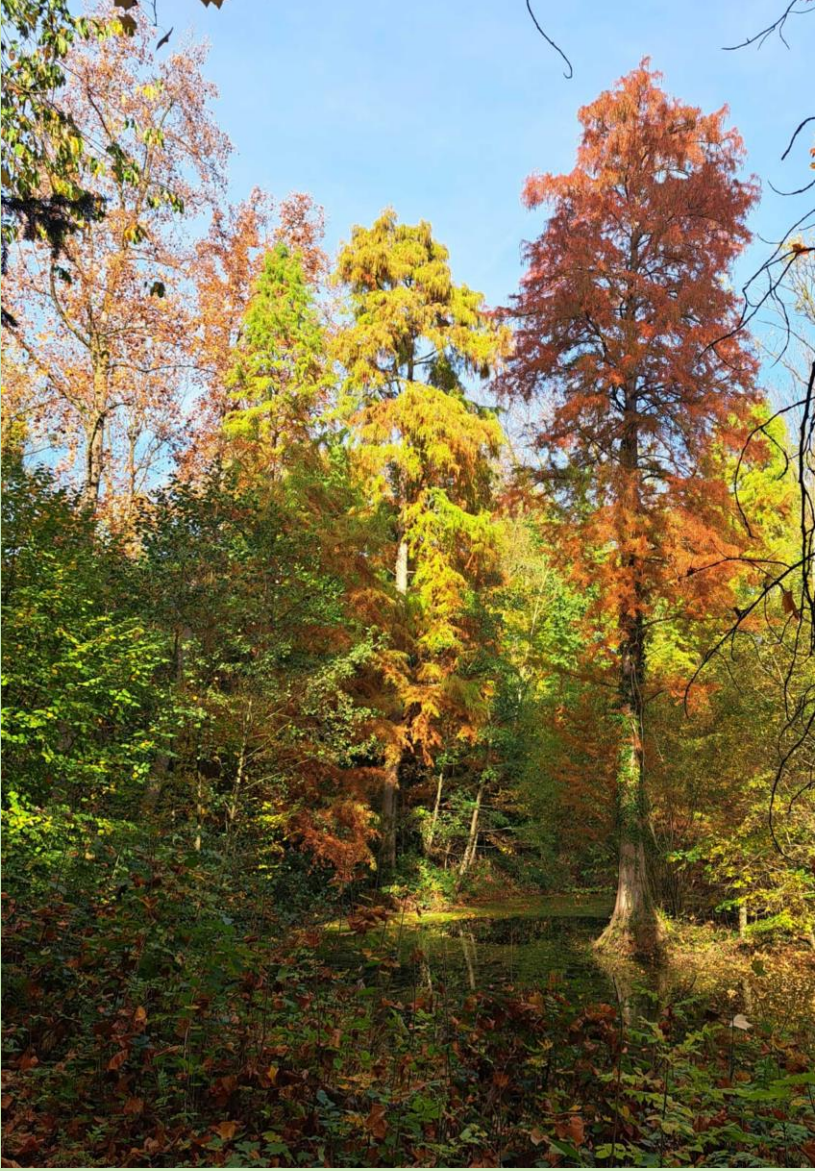
আলোক চিত্র

ছবির নামঃ জার্মানির নেউস-এর একটি জঙ্গলের দৃশ্য...

(A scene of a jungle at Neuss in Germany...)

আলোকচিত্র গ্রাহকঃ ইউডিথ ফান্ডস্টাইন (Judith Pfundstein)

সবাই জানাবেন এই আলোকচিত্রটি কেমন লাগল...

नমামি দেবী নর্মদে

শিব দুহিতা নর্মদা

অষ্টম পর্যায় (১)

ডাঃ অমিত চৌধুরী

স্কন্দপুরানে শিব পার্বতীকে বলেছেন, "দেবী, ওঙ্কারেশ্বর সম্পর্কে তোমাকে যা বলি মন দিয়ে শোনো – চার বেদ পাঠ করলে যে পুণ্য লাভ হয়, ওঁঙ্কারেশ্বর দর্শন-মাত্রই তার থেকে বেশি পুণ্য হয়। সারা জীবন ব্রহ্মচর্য পালন করলে যে ফল হয়, ওঁঙ্কারেশ্বর দর্শন মাত্রই সেই ফলের অধিকারী হওয়া যায়। সারা জীবন অহিংস, সত্যবাদী এবং সদাচারী থেকে যে ফল লাভ হয়, ওঁঙ্কারেশ্বর দর্শন-মাত্রই সেই ফল লাভ হয়। আর এই সবের সহস্র গুণ ফল পাওয়া যায় ওঁঙ্কারেশ্বরের পুজো করলে।"

আমরা সেই ওঁঙ্কারেশ্বরের দক্ষিণ পাড়ে দাঁড়িয়ে আছি। দক্ষিণ পাড়ে মমলেশ্বর আর উত্তর পাড়ে ওঁঙ্কারেশ্বর। মাঝখানে নদী ঐ বয়ে চলে যায়। বিন্ধ্যাচল পাহাড়ের তিনটে চূড়া আছে। যার একটি উত্তর তটে অবস্থিত। যেখানে স্বয়ং ওঙ্কারেশ্বর বিরাজমান। আর দক্ষিণ পাড়ে আছেন ব্রহ্মা ও বিষ্ণুপুরী। আমরা এগিয়ে চলেছি মার্কণ্ডেয় শীলাকে ডানদিকে রেখে।

১০ই নভেম্বর ২০১৭ – দুপুরে বোম্বে মেল হয়ে খাণ্ডুয়া হয়ে ওঁঙ্কারেশ্বরে এসে পৌছেছি। রাতে আশ্রয় স্থল গজানন আশ্রম।

নমামি দেবী নর্মদে

আমরা খুব ভোরে পুজো আরতি করে বেরিয়ে পড়েছি।

আজ ১২ই নভেম্বর, নর্মদার পাড় ধরে সেই বাঙালী সাধুর কুঠিয়াকে বাঁদিকে রেখে আস্তে আস্তে পাহাড়ের গহ্বরে ঢুকে যাচ্ছি। বেশ কিছু সাধু তাদের কুঠিয়াতে বসে নর্মদার দিকে মুখ করে ধ্যান মগ্ন হয়ে আছেন। আগের বারের সেই বাঙালী সাধুটির দর্শন পেলাম না। কিন্তু অন্য এক বৈষ্ণব সাধু আমাদের নদীর পাড় দিয়ে পরিক্রমার মার্গটি দেখিয়ে দিলেন।

ওঁঙ্কারেশ্বর উত্তর পাড়ে বিরাজমান। দক্ষিণ পাড়ের লোকেরা তাঁর দর্শন পান না। কারণ নর্মদার প্রবল স্রোতকে উপেক্ষা করে উত্তর পাড়ে যাওয়া প্রায় অসম্ভব। তাই শঙ্করাচার্য শিবের তপস্যা করে তাঁকে তুষ্ট করে এই কথা নিবেদন করলেন। ভক্ত বৎস্যল আশুতোষ শিব দক্ষিণ পাড়ে মমলেশ্বর বা অমলেশ্বর নামে বিরাজিত হলেন। আচার্য শঙ্করকে তিনি বললেন, "উত্তরে ওঁঙ্কারেশ্বরের দর্শন করলে যে ফল হবে, দক্ষিণ পাড়ে মমলেশ্বর বা অমলেশ্বর দর্শন করলেও একই ফল হবে।"

এবারে কিছু নীতিগত কারণের জন্য দিব্যানন্দজী নেই। কাকাজী আর অশোক দাসজী তো আছেনই সঙ্গে যোগ হয়েছে আমার সহকারী সঞ্জয়। গত ফেব্রুয়ারীতে পরিক্রমার সময় সঞ্জয় আমাদের সঙ্গে ছিল। ওঁঙ্কারেশ্বরের ঝাঁড়ির যত ভেতরে যাচ্ছি ততই কিছু মুক্তিকামী ধ্যানমগ্ন মানুষ দেখতে পাচ্ছি। খুব সন্তর্পনে তাঁদের কুঠিরের পাশ দিয়ে এগিয়ে

চলেছি। এরই মধ্যে কয়েকবার পথ হারিয়ে ফেললাম। কিছু মেষ পালক আমাদের পরিক্রমার মার্গ দেখিয়ে দিল।

দুপুরের একটু আগে প্রায় ১১টার সময় ওঁঙ্কারেশ্বরের পাহাড়ের উপরে মৌনীবাবার আশ্রমে এসে পৌঁছালাম।

দশ কিলোমিটারের মধ্যে কোনো আশ্রম বা থাকার জায়গা নেই। খুবই দুর্গম ওঁঙ্কারেশ্বর ঝাড়ি তাই আশ্রমের লোকেরা ভোজন এখানেই করে যেতে বললেন। মৌনী বাবার সাথে দেখা করতে গেলাম। বিলাসবহুল ঘর, দামী টিভি, দামী মোবাইল ইত্যাদি সবই আছে। ঝুল বারান্দায় নর্মদার দিকে মুখ করে বসার জন্য একটি দোলনাও আছে। আমাদের বসতে বললেন, কিন্তু কথা বলে চলেছেন অন্য ভক্তদের সাথে। কথার বিষয় বস্তু – এই সব বাঙালীদের পরিক্রমা করার অধিকার কে দিল? ঘরে দেখলাম তারাপীটের বামাক্ষ্যাপা, শঙ্করক্ষ্যাপাসহ কিছু বাঙালী সাধু সন্ন্যাসীর ছবি। কিছুক্ষণ পরে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, “তোমরা বাঙালী তো তাই তোমাদের বুদ্ধি কম।” মৌনী বাবা এখন আর মৌনী নন। তাই অনর্গল বলে চলেছেন, বাঙালীরা পরিক্রমা করার যোগ্যই নয়। কোনো বাঙালী ঠিক মতো পরিক্রমা করতে পারে না। তাছাড়া, যেহেতু তারা মাছ খায়, এই পরিক্রমা মা নর্মদা স্বীকার করেন না। পরে হাসতে হাসতে বললেন, “আমার গুরুও বাঙালী।” বলে গুরুর ছবিটি দেখালেন। আমি বললাম, “ঠিকই বলেছেন বাঙালীদের বুদ্ধি কম। তা না হলে বাঙালী

গুরু আপনাকে দীক্ষা দেন!” উনি আমার কথা বুঝতে না পেরে বললেন, “তুম ক্যেয়া বোলা?” আমি বললাম, “কুছ নেহি তো। নর্মদে হর।” আমরা উঠে পড়লাম।।

আমরা চলে এলাম নদীর ঘাটে। স্নান করতে করতে মায়ের কাছে প্রার্থনা করলাম, “মা গো, প্রকৃত সাধুর দর্শন যদি নাও দাও এই সব ভেকধারী, গুরু নিন্দাকারী, (অ)সাধুদের দর্শন দিও না। এতে মন সংযোগ নষ্ট হয়ে যায়। পরিক্রমায় বিঘ্ন ঘটে।” কাঁদছিলাম কিনা জানি না। কাকাজী আমার গায়ে হাত দিয়ে বললেন, “ডাঃ বাবু আবেগপ্রবণ না হয়ে চলুন কিছু খেয়ে নিন। যদিও খাওয়ার ইচ্ছা ছিল না, তবুও এদের অনুরোধে বসতেই হল।

দুপুর একটা। বেরিয়ে পড়লাম দুর্গম ওঁঙ্কারেশ্বরের ঝাড়ির মধ্যে দিয়ে। বাঁ-দিকে বিন্ধ্যাচল পর্বত মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, যেহেতু অগস্ত্যমুনি নেই, তাই এখানে মাথা নোয়ানোর প্রশ্ন নেই। ডানদিকে স্রোতস্বিনী নর্মদা বয়ে চলেছেন পৃথিবীকে কলুষ মুক্ত করতে।

এক-একটা পা ফেলতে হচ্ছে খুব সাবধানে। একটু উল্টোপাল্টা হলেই পড়ে যেতে হবে প্রায় ২৫০ ফুট নীচের নদীতে, পাহাড়ের হাত বদল হতে হতে মা নর্মদার শীতল কোলে চির বিশ্রামের দেশে। এই ভাবে প্রায় আড়াই ঘন্টা অবর্ণনীয় পরিশ্রমের পর পেলাম একটি আপাত সমতল জায়গায় একটি আশ্রম। এটি লোমশ মুনির আশ্রম। গায়ে খুব বড়ো বড়ো লোম থাকার জন্য মহাভারতের যুগে ইনি

লোমশ মুনি নামে পরিচিত ছিলেন। মহাভারতে পাওয়া যায় এই লোমশ মুনি ভীষ্মের শরশয্যার সময় ব্যাসদেবের সাথে তাঁর সাথে দেখা করতে এসেছিলেন।

লোমশ মুনির আশ্রমে একটি কুণ্ড আছে নাম নরসিংহ কুণ্ড। এই কুণ্ডটি নর্মদার জলে পূর্ণ, লোমশ মুনি প্রত্যহ এই কুণ্ডে স্নান করতেন। মার্কেণ্ডয়র মতো লোমশ মুনিও সপ্তকল্প জয়ী এবং প্রতি কল্পে তাঁর গায়ের থেকে কিছু লোম খসে পড়ত। মোহন্তের কাছে শুনলাম এখানে যোগ সাধনার শিক্ষা দেওয়া হয়। অনেক ছাত্র আসে, তারা প্রায় সবাই সাধু-সন্ন্যাসী।

নরসিংহ কুণ্ড এবং আশ্রমকে প্রণাম করে এগিয়ে চললাম। অনেকটা জায়গা নিয়ে আর একটি আশ্রমের দেখা পেলাম। গ্রামটির নাম বিনারাকুদ। রাস্তা বলে কিছু নেই। দু-দিকে আখের ক্ষেত। মাঝখান দিয়ে পায়ে চলার রাস্তা। বেশ কিছুটা যাওয়ার পরে ভালো রাস্তা পেলাম। রাস্তার কাজ হচ্ছে এবং একটি খুব বড়ো আশ্রমের দর্শন পেলাম। এটি ব্যাঙ্গালোরবাসী রবিশঙ্করজীর আর্ট অফ লিভিং-এর আশ্রম। ঘটের আকৃতিতে একটি বিশাল জলাধার তৈরী হচ্ছে প্রায় এককাঠা জমির ওপর — বিশাল বড়ো আশ্রম। কবে কাজ শেষ হবে জানি না। তবে এ এক কর্মযজ্ঞ। বিকাল পাঁচটা বেজে গেছে। একটি চায়ের দোকানে বসে বিশ্রাম নিলাম। আর এগোনোর ইচ্ছা ও শক্তি কোনোটাই নেই। তবে অশোক দাসজীর ইচ্ছা আর একটু এগিয়ে গেলে ভালো

আশ্রম পাওয়া যায়। এবারের পরিক্রমায় অশোক দাসজী আমাদের পথপ্রদর্শক। গ্রামটির নাম মোরটক্কা। গ্রাম না বলে আধা শহর বলা ভালো। সারাদিন ধরে হাঁটলাম কিন্তু এলাম মাত্র বারো কিলোমিটার। পাহাড় অতিক্রম করতেই আমাদের সমস্ত শক্তি শেষ। এরই মাঝে প্রায় ছ'টা বেজে গেছে। আর কতটুকু এগোতে পারবো এই চিন্তা করে এখানেই থাকার সিদ্ধান্ত নিলাম। সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডার প্রকোপ বেড়ে চলেছে। তাই রাস্তার পাশেই একটি জৈন আশ্রমে আজ রাতের মতো আসন পাতলাম। আজ ১২-১৩ কিলোমিটারের বেশি মোটেই হাঁটা হলো না।

"নর্মদে হর"

...ক্রমশ ■

প্রকাশিত সংখ্যা - ২০১৯

http://online.fliphtml5.com/osgiu/genc/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/zczy/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/btzm/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/fyxj/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/tebb/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/ddla/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/btss/

পাঠকদের সুবিধার্থে নিঃশুল্ক বাংলা অনলাইন সাহিত্য পত্রিকা **'গুঞ্জন'এর ২০১৯ এ প্রকাশিত সব সংখ্যাগুলির ই-লিঙ্ক পুনরায় দেওয়া হল।**

প্রকাশিত সংখ্যা - ২০২০

http://online.fliphtml5.com/osgiu/kjbd/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/hljw/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/lmjq/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/dadg/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/lgaq/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/tefw/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/eitj/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/vsgw/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/lpsr/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/xnih/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/buzn/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/mjwo/

পাঠকদের সুবিধার্থে নিঃশুল্ক বাংলা অনলাইন সাহিত্য পত্রিকা **'গুঞ্জন'এর ২০২০ তে প্রকাশিত সব সংখ্যাগুলির ই-লিঙ্ক এখানে দেওয়া হল।**

মুমূর্ষু

সুধীর বরণ মাঝি

বিবেকের ঘরে ঝুলছে তালা
মানবতা হয়েছে সেকেলের...
চলছে সংকট মূল্যবোধের,
মনুষ্যত্ব আজ লাইফসাপোর্টে।

বিশ্ব মোড়লদের যুদ্ধ যুদ্ধ খেলায়
বিশ্বব্যাপী ক্ষুধার তীব্রতা, ক্ষুধার্ত মানুষের ক্ষুধার যন্ত্রণা...
মরছে মানুষ অনাহারে, অর্ধাহারে...
ধুকছে মানুষ বিনা চিকিৎসায়।

মানব বিকাশ সংকোচিত প্রশ্নবিদ্ধ
মুমূর্ষু পরিবেশ...
শতকোটি শিশু আছে ঝুঁকিতে জলবায়ু পরিবর্তনে...
সংকটাপন্ন জীবনের জীবিকা।

হানাহানি, অন্ধবিশ্বাস, ধ্বংস করে সভ্যতা,
গড়ছে তারা টাকার পাহাড়...
কি যায় আসে তাতে – মরছে মানুষ মরুক।

গুটিকতক পেশাদার ছদ্মবেশী মানব খুনি
সম্পদ লুণ্ঠনের নেশায়

বোধ

অশান্ত নরক করে রেখেছে
আমাদের আবাসভূমি।

মুমূর্ষু জীবন সংকট পরিত্রাণে
জেগে উঠুক মনুষ্যত্ব জেগে উঠুক মূল্যবোধ মানবসত্তা...
গড়ে উঠুক বিশ্বভ্রাতৃত্ব সাম্যের সমাজ।। ■

‘গুঞ্জন’-এর আগামী সংখ্যাগুলি
ডিসেম্বর ২০২২ – অণু সংখ্যা
জানুয়ারি ২০২৩ – ইংরাজী নববর্ষ সংখ্যা

রোমাঞ্চ

গভীর গোপন

প্রথম পর্ব, চতুর্থ অধ্যায়

শান্তিপদ চক্রবর্ত্তী

সুবর্ণরেখা জানে যে তার শ্বশুরমশাই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ মামলার সমাধান ও রায়দান উনি করেছিলেন। ওনার চোখকে ফাঁকি দেওয়া অত সহজ হবে না। ইতিমধ্যে এ পর্যন্ত উনি যা যা বলেছেন, তা বেশ ইঙ্গিতপূর্ণ। কিন্তু এখনই ওনাকে সব কথা না বলে, আগে বালিগঞ্জ থানা থেকে ঘুরে এসে সব বলা যাবে। তাই সে শ্বশুরমশাইকে বলল, "বাবা কালকে আগে আমি থানা থেকে ঘুরে আসি, ওদের সব কথা শুনি, তারপর ফিরে এসে আমি আপনাকে সব কথা জানাবো। তবে আমি কোনরকমভাবে কণিকার খুনের সঙ্গে জড়িত নই। কিন্তু ..." এই বলে মাথা নীচু করে সুবর্ণ কাঁদতে লাগলো, তাই দেখে নীলুর মনের ভিতরটা উথালপাথাল করে উঠল। সুরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, "কিন্তু কি!"

– আমি থানা থেকে এসে সব জানাবো, আপনি খালি এইটা ব্যবস্থা করুন যে থানায় ইনটারোগেট করতে করতে ওরা যেন আমাকে অ্যারেস্ট করে লক-আপে ঢুকিয়ে দিতে না পারে।

– সেটা possible কিনা এখনই আমি বলতে পারবো না। তবে আর একটা কথা তোমাদের বলিনি, কালকে থানায়

যাবে তাই বলে রাখি, সতীশকে কোর্টে তোলা হয়েছিল, তার জামিন হয়নি, জেল হেফাজত হয়েছে। আগামী তিন চার দিন পর আবার কোর্টে appear হতে হবে। বেস্ট lawyer provide করা হয়েছে। আশা করি এবারে জামিন পেলেও পেতে পারে। কিন্তু তার বিরুদ্ধে সরাসরি খুনের অভিযোগ আছে, and this is just for your information. হ্যাঁ, যা বলছিলাম, তোমরা থানায় যাবার আগে আমি এস.পি., ডি.এস.পি.-র সঙ্গে কথা বলে নেব।

কথাগুলো বলে সুরেন্দ্র একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তিনি ভাবতেও পারেননি যে এইরকম একটা ঘটনা তাঁর নিজের জীবনেও ঘটবে।

সারা রাত সুবর্ণরেখা ঘুমায়নি, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছে আর নিলুও দু'চোখের পাতা এক করতে পারেনি। কালকের দিনটায় যে কি ঘটবে সেটা একমাত্র পরমেশ্বরই জানেন... ভোররাতে সুবর্ণ ঘুমিয়ে পড়তে নীলু বালিশ থেকে ঘাড় তুলে সুবর্ণর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কি মিষ্টি মুখটা... এই মিষ্টি মুখ, আর মিষ্টি কথাতে নীলু মোহিত হয়ে গিয়েছিল, ওকে না ভালোবেসে পারেনি। অনেক স্বপ্ন দেখা তাদের জীবনে এখনও বাকি পড়ে আছে, কিন্তু মাঝপথে উদ্যাম ঝড় এসে সব কিছু লন্ডভন্ড করে দিল। কম্পিত হাতে সুবর্ণর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে, সে নিজেও যে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে জানে না, ঘুম ভাঙলো মায়ের ডাকে, "এই খোকা, এই

খোকা উঠে পড়। অনেক বেলা হয়ে গেছে, তোদের তো আবার যাবার সময় হয়ে যাচ্ছে।” ধরমর করে বিছানা ছেড়ে উঠে সুবর্ণকে ঠেলে তুলে দিল নিলু।

স্নান করে, ভারী ব্রেকফাস্ট করে বাবাকে বলে ওরা থানার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল। বালিগঞ্জ থানায় যখন পৌঁছালো ওরা, তখন ঘড়ির কাঁটা প্রায় এগারোটা ছুঁই ছুঁই। চিঠিটা আর্দালির হাতে দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল দু'জনে। দশ মিনিট পর একজন কনস্টেবল এসে বলল, “সুবর্ণরেখা চ্যাটার্জিকে ও.সি. সাহেব ঘরে ডাকছেন।” নীলুর দিকে তাকিয়ে সে বলল, “আপনি বাইরে অপেক্ষা করুন, দরকার পড়লে আপনাকে ডাকা হবে।”

– আসবো স্যার?

– হ্যাঁ আসুন, বসুন। So, you are Subarnorekha Chatterjee... I am Sudhir Batobyal, Officer-in-Charge, Ballygunge P.S. সুবর্ণরেখা দেবী, আপনি তো অনেক কিছু জানেন, কণিকা হত্যা মামলার ব্যাপারে?

– আজ্ঞে না স্যার, সবটা জানি না।

– আপনি মানালি বেড়াতে গিয়েছিলেন কেন?

–অবান্তর প্রশ্ন। আমি কোথায়, কেন বেড়াতে গিয়েছিলাম, সেটা আমি কাউকে বলতে বাধ্য নই।

– না, তা বলতে বাধ্য নন, কিন্তু একটি হত্যাকাণ্ডের পর পরিকল্পিতভাবে বেড়াতে যাবার নিশ্চই কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে।

– What do you mean?

– I think you went to Manali not for a pleasure trip but to avoid this situation.

– না, মোটেই তা নয়, আমরা বেড়াতে গিয়েছিলাম।

– আচ্ছা, আপনি কি জানেন মিস্টার সতীশ চ্যাটার্জী, যে এখন জেল হেফাজতে আছে, সে কিন্তু আপনার নাম করে বলেছেন, আপনি ঘটনার দিন ওনার সঙ্গে ছিলেন।

– কেউ কারোর সঙ্গে থাকলে এটা প্রমাণ হয় না যে সে ঐ ঘটনার সময় উপস্থিত ছিল।

– Very smart answer. কিন্তু সুবর্ণদেবী... ক্রিং, ক্রিং, ক্রিং, 'হ্যাঁ হ্যালো স্যার, গুড মর্নিং স্যার, হ্যাঁ উনি এসেছেন, আমার সামনে বসে আছেন... না স্যার, জেরা চলছে। স্যার তা প্রায় দু-ঘন্টা লাগবে। হ্যাঁ স্যার, না স্যার, নিশ্চয়ই। আমি আপনাকে ফোন করে জানিয়ে দেব স্যার। হ্যাঁ, নমস্কার স্যার...'

সুবর্ণরেখা বুঝতে পারলো টেলিফোনের ওপারে নিশ্চয়ই কোন বড় অফিসার ছিলেন। তাই ও.সি. বাবাজি হ্যাঁ স্যার, না স্যার করছিল। যদি বাবা এস.পি.-কে বলে দেন, তাহলে কাজ তো নিশ্চয়ই হবে। দেখি ও.সি. বাবাজি এবার কি বলেন? সুবর্ণরেখা খুব স্ট্রেট ব্যাটে খেলছিল। সে একটা জিনিস বুঝে নিয়েছিল যে প্রথম থেকে ভয়ে জুজু হয়ে থাকলে সাঁড়াশির মতো ওরা চেপে ধরবে। তাই যতক্ষণ

ইনটারোগেশন চলবে, তাকে চেষ্টা করে যেতেই হবে।

হঠাৎ ও.সি. গলার স্বর খাদে নামিয়ে বললেন, "ম্যাডাম আপনি বলেছিলেন যে ঘটনার দিন আপনি ছিলেন না। ব্যাঙ্কের কনফারেন্স এটেন্ড করতে গিয়েছিলেন, সেটা কি সত্যি?"

সুবর্ণ খুব বুদ্ধি করে উত্তর দিল, "হ্যাঁ সেটা সত্যি, আবার সেই অর্থে সত্যিও নয়।"

– মানে?

– তা পুলিশ তো ব্যাঙ্কে খোঁজ নিয়ে নিশ্চয়ই জেনেছে যে শেষ মুহূর্তে প্রোগ্রামটা ক্যানসেল হয়ে গিয়েছিল।

– হ্যাঁ তা জেনেছে, কিন্তু আপনার মুখ থেকে আমি শুনতে চাই।

– দেখুন আমার বেরোবার সময় ছিল ঠিক সকাল দশটা। আমি সেই সময় রেডি হবার জন্য খুব ব্যস্ত ছিলাম। তখন যে ব্যাঙ্ক থেকে ফোন এসেছিল সেটা আমি চেক করিনি বা মোবাইল খুলে দেখিনি।

– তা কখন আপনি জানলেন যে কনফারেন্সটা finally ক্যানসেল হয়ে গেছে?

– সেটা সম্ভবতঃ সাড়ে এগারোটা বা বারোটা হবে। তখন মোবাইল চেক করে দেখি, তিন চারটে মিস কল ও একটা sms.

– হ্যাঁ sms টা আপনি নিশ্চয় পড়েছেন।

– হ্যাঁ, তখন পড়ে জানতে পারি যে প্রোগ্রামটা ক্যানসেল হয়েছে।

– কিন্তু আপনি বাড়িতে বা আপনার স্বামীকে সেটা জানাননি কেন? আর বাড়ি ফিরে না গিয়ে সারাদিন কোথায় গিয়েছিলেন, আর গিয়েছিলেন তো রাত্রিরে বাড়ি ফিরলেন না কেন?

– আসলে আমার হাজব্যান্ড বাড়িতে ছিলেন না, অফিসে গিয়েছিলেন, বাড়ি ফিরে বোর হয়ে যাবো, তাই এক বান্ধবীর বাড়ি চলে গিয়েছিলাম।

– সেটা কোথায়?

– কসবা বাইপাসের ধারে।

– নাম?

– দীপিকা স্যানাল।

– ভালো কথা, কিন্তু সেটা আপনি নিশ্চয়ই দুপুরে গিয়েছিলেন, কিন্তু রাত্রিরে বাড়ি না ফেরার কারণ কি?

– না দুপুরে যাইনি, সন্ধ্যার সময় গিয়েছিলাম।

–তা সারাদিন কি আপনি রাস্তায় টো টো করে ঘুরছিলেন?

– Mind your language...

– হুঁ, তাহলে কোথায় গিয়েছিলেন?

– আমি একটু কেনাকাটা করতে গিয়েছিলাম।

– তা কোথায় কেনাকাটা করতে গিয়েছিলেন।

– এই নিউ মার্কেট, গড়িয়াহাট...

– কিছু কিনেছিলেন কি?

– হ্যাঁ, গড়িয়াহাট থেকে...

– দোকানের নাম বলুন...

– মনে নেই।

– তাহলে ক্যাশমেমো দিন...

– সঙ্গে আনিনি।

– তা পরের দিন সঙ্গে অবশ্যই নিয়ে আসবেন।

একথা শোনার পর সুবর্ণর চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল এই ভেবে যে আজকে অন্তত পুলিশ তাকে কাস্টাডিতে বা লক আপে ঢোকাবে না, কারণ অফিসার তাহলে পরের দিন ক্যাশমেমো নিয়ে আসার কথা উল্লেখ করতেন না।

– তা, আপনার সঙ্গে সারাদিনের সফর সঙ্গী কে ছিলেন? নিশ্চয়ই সতীশবাবু?

সুবর্ণ উত্তেজিত হয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠলো, “না না...”

–ম্যাডাম এটা থানা, পাবলিক প্লেস নয়। Don't shout.

অফিসার টেবিলের উপর রাখা বেলটা বাজাতে আর্দালি এসে উপস্থিত হল।

– জি স্যার...

– দু-গ্লাস জল সঙ্গে চা ও বিস্কুট। বাইরে ওনার স্বামী বসে আছেন, ওনাকেও দিও।

– জি জরুর স্যার।

চা-জল এলে, সঙ্গে সঙ্গে সুবর্ণ ঢকঢক করে এক গ্লাস

জল খেয়ে নিল। বকতে বকতে জিভ-মুখ শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। পুলিশরা ঠিক বুঝতে পারে। চা খেয়ে চরম তৃপ্তি পেল সুবর্ণ। খুব ভালো কোয়ালিটির চা।

– তা আপনি বলছেন, সারাদিন আপনি একা একা ঘুরেছেন।

– হ্যাঁ।

– মিথ্যা কথা।

– আপনি সারাদিন সতীশবাবুর সঙ্গে ছিলেন এমন কি রাত্রিরেও...

– না না কিছুতেই না, সম্পূর্ণ মিথ্যা...

– কিন্তু সতীশবাবু যে বলেছেন আপনি ছিলেন।

– সেটা উনি মিথ্যা বলেছেন।

– প্রমাণ আছে?

ক্রিং ক্রিং ক্রিং 'Good afternoon sir... না, উনি এখনও আছেন। না স্যার, কমপ্লিট হয়নি, অনেক অনেক বাকি। হ্যাঁ স্যার, এক্ষুনি করছি। হ্যাঁ পাঁচ মিনিটের মধ্যে...'

আবার টেবিলের উপরের বেলটা বাজালেন অফিসার। আর্দালি হাজির হয়ে বলল, "জি স্যার..."

– বাইরে ওনার স্বামী বসে আছেন, এক্ষুনি ডেকে নিয়ে এসো।

নীলোৎপল হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকল। অফিসার বললেন, "আমাদের জেরা এখনো কমপ্লিট হয়নি। আজকে এই পর্যন্ত আগামী শুক্রবার দিন আবার আসতে হবে। মোটামুটি টাইম বেলা তিনটে।"

সুবর্ণর দিকে তাকিয়ে একটা কাগজ এগিয়ে দিয়ে, অফিসার বললেন, "সই করুন।" সুবর্ণ সই করার পর নীলোৎপলকে উনি বললেন, "আপনি নীচে সই করুন ও মোবাইল নম্বর দিন।"

তারপর সুবর্ণর দিকে তাকিয়ে অফিসার বললেন, "আপনার মোবাইলটা দিন যেটা ঘটনার দিন আপনার কাছে ছিল।"

সুবর্ণ মোবাইলটা এগিয়ে দিলে অফিসার বললেন, "এই মোবাইলটা আমরা বাজেয়াপ্ত করলাম।"

– কিন্তু আমার সব জরুরি ফোন নম্বর?

– কিছু করার নেই ম্যাডাম, দুদিন পর পাবেন।

আবার বেল, আবার আর্দালি – "জি স্যার..."

– কার্তিকবাবুকে ডাকো।

কার্তিকবাবু সাব-ইন্সপেক্টর। 'স্যার,' বলে কার্তিকবাবু ঘরে এলে ও.সি. বললেন, "এই মোবাইলটার একটা চালান করে দাও এক্ষুনি। এবার আপনারা যেতে পারেন।"

স্বস্তির নিঃস্বাস ফেলে সুবর্ণ আর নীলু কার্তিকবাবুর থেকে চালান নিয়ে থানা থেকে বেরিয়ে সবে সিঁড়িতে পা রেখেছে, এমন সময় আবার ও.সি.-র ঘরে নীলুর ডাক পড়ল।

– স্যার, আমাকে ডেকেছেন... নীলু বলে উঠল।

– এই দু'দিন বাড়ির থেকে সুবর্ণদেবী যেন এক পাও বাইরে বেরতে না পারেন। পুলিশ কিন্তু আপনাদের বাড়িতে নজরদারি রাখছে।

যে কোন সময় পুলিশ বাড়িতে যেতে পারে মনে থাকে যেন। এবার আসুন।

একরাশ নিরাশা নিয়ে ওরা থানা থেকে বের হল। একটু এগিয়ে গিয়ে একটা চায়ের দোকানের বেঞ্চিতে নীলোৎপল ধপাস করে বসে পড়ল। সুবর্ণ বলল, "কি হলো, শরীর খারাপ করছে?"

– না, মাথাটা ধরে গেছে, তুমিও বসো, একটু চা খাও।

– আচ্ছা, সুবর্ণ থানায় অফিসার কি বললেন?

– চা খেয়ে আগে বাড়ি চলো তারপর সব বলছি।

নীলোৎপল হাতের চেটো দিয়ে কপালটা চাপড়ালো।

– কি হলো, তোমার কি হলো, একটু শান্ত হও প্লিজ..."

বেঞ্চির পাশে বসে সুবর্ণ নীলুর হাতটা চেপে ধরে কাঁদতে লাগল।

...ক্রমশ ■

হস্তাঙ্কন

ছবির নামঃ ধূর্জটি...

শিল্পীঃ সঞ্জনা দাস **বয়সঃ** ১৩ বছর

সবাই জানাবেন এই উদীয়মান শিল্পীর ছবিটি কেমন লাগল...

আমরা ছোটদের আঁকা ভাল ছবি চাই। অবশ্যই পাঠানো ছবি মনোনীত হলে তা 'গুঞ্জন'-এ প্রকাশিত হবে, তিন মাসের মধ্যে। কোন প্রাপ্তিস্বীকার করা সম্ভব নয়। শিল্পীর নাম বয়স ও ছবি চাই। আমাদের ই-মেলঃ **contactpandulipi@gmail.com**

প্রকাশিত সংখ্যা - ২০২১

https://online.fliphtml5.com/osgiu/wlch

https://online.fliphtml5.com/osgiu/ymfp

https://online.fliphtml5.com/osgiu/kabb

https://online.fliphtml5.com/osgiu/inhj

https://online.fliphtml5.com/osgiu/nmnj

https://online.fliphtml5.com/osgiu/ckkh

https://online.fliphtml5.com/osgiu/tlro

https://online.fliphtml5.com/osgiu/ehsn

https://online.fliphtml5.com/osgiu/ogbi

https://online.fliphtml5.com/osgiu/zrsw

https://online.fliphtml5.com/osgiu/iirn

https://online.fliphtml5.com/osgiu/uuyz

পাঠকদের সুবিধার্থে

নিঃশুল্ক বাংলা অনলাইন সাহিত্য পত্রিকা 'গুঞ্জন'-এর ২০২১ এ প্রকাশিত সব সংখ্যাগুলির ই-লিঙ্ক এখানে দেওয়া হল।

গুঞ্জন পড়ুন ~ গুঞ্জন পড়ান

স্মরি যাতনা, শর বেদনা

রাজশ্রী দত্ত (নীলাঞ্জনা)

এক নীরব শান্ত শয্যা, স্রোতস্বিনী গঙ্গার তীরে
এক-দুই-তিন করে মন্থর বেগে প্রহর বইছে,
হয়ে ফলগু ধারা নদী, আর
বাতাসের উত্তাল বৈপরীত্যের সাথে দ্বন্দ্ব ভুলে
বিন্দু বিন্দু সিঁদুরের মাখা শয্যা মাঝে
"এ কোন অপরিচিত তুমি!"
"আমি চিনি কি তোমাকে?"
"নাহ নাহ, চিনতে পারছি না।"
"এ আমার কঠিন ব্যর্থতা সকল জয়ের শেষে।"
"কোথায় তোমার বীরত্ব? কোথায় তোমার ঔজ্জ্বল্যের গরিমা?"

"আমি চাইনি এ বিষম সিদ্ধি লাভ! যা অন্তিমে আনে...
জয়ের মাঝে সর্বহারা নিঃস্ব হওয়ার অনুভুতি
দীর্ঘ এক দশকে সংকল্প, প্রতিজ্ঞা, প্রতিশোধ স্পৃহা...
ঘুন ধরে আছে তোমার শেষ যাত্রাকালে।
হায় রে নিয়তি! এ কি সত্যি নাকি মধ্যরাতের দুঃস্বপ্ন!
অম্বার জ্বালা জুড়িয়েছে ঠিকই, কিন্তু...
কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে বেড়েছে শিখণ্ডীর অন্তর দহন।"

ধীর পায়ে, আনত মুখ আর অপলক দৃষ্টি মেলে

অনুশোচনা

এসে দাঁড়ান জাহ্নবি তীরে শর-শয্যা সম্মুখে।
জ্যোৎস্নার স্মিত কিরণে মুক্তধারা অশ্রু দেখি চমকে পিতামহ....
অন্তরের অব্যক্ত ক্ষোভহীন বেদনা দেখি
বুঝিতে পারে না এ কোন বীরাঙ্গনা?
এই অশ্রু সাজে না শিখণ্ডীর, না সাজে তেজস্বী অম্বার।
ভীষ্মের হৃদয়ে হতে ব্যক্ত হয় নিষ্ঠুর বার্তা।

"কেন এ অশ্রু? কিসের তরে শোক তাপ!
বিধাতার লেখন মাঝে নেই কোন হাত।
তবে এ মৃত্যু জ্বালা হতে নেই কোনো ভয়
ভয় যদি হয় তা একটাই..."
কম্পিত হৃদয়ে আর জিজ্ঞাসু নয়নে শিখণ্ডী জানতে চায়
কোন ভয়ে ভীত হলেন পিতামহ ভীষ্ম?
রাতের মৃদু বাতাসের ন্যায় মৃদু স্বরে বলিলেন সবে
"প্রতিশোধের মাঝে থাক তোমার বীরত্বের গাথা।
নাইবা করলে শোক, নাইবা করলে অনুতাপ।
সব কিছুর মাঝে কেবল বীরত্ব জীবিত থাক।
মৃত্যুরে করি না ভয়, করি ভয় বীরত্বহীন অনুশোচনারে...
যাও ফিরে যুদ্ধ ক্ষেত্রে ভুলে সকল শোক...
এগিয়ে চলো সমর মাঝে সত্য ও ন্যায়ের জয় হোক।"
প্রণাম করি চলেন শিখণ্ডী যুদ্ধ অভিমুখে।
রয়ে যায় অম্বার মায়া ভরা হৃদয়, ভীষ্মের শয্যা তটে।। ■

ছবির নামঃ গোয়ার কেল্লা...

আলোকচিত্র গ্রাহকঃ প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পিকে)

সবাই জানাবেন এই আলোকচিত্রটি কেমন লাগল...

আলোক চিত্র

ছবির নামঃ প্রাতঃভ্রমণ...

আলোকচিত্র গ্রাহকঃ প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পিকে)

সবাই জানাবেন এই আলোকচিত্রটি কেমন লাগল...

আলোক চিত্র

ছবির নামঃ ছত্রাক...

আলোকচিত্র গ্রাহকঃ প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পিকে)

সবাই জানাবেন এই আলোকচিত্রটি কেমন লাগল...

আলোক চিত্র

ছবির নামঃ বিশ্বাস...

আলোকচিত্র গ্রাহকঃ প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পিকে)

সবাই জানাবেন এই আলোকচিত্রটি কেমন লাগল...

বৈরী

প্রসূন কান্তি ভট্টাচার্য্য

সময়টা গত শতাব্দীর সাতের দশকের শুরু। ভারতের বুকে বসন্তের বজ্রনির্ঘোষ যায় শোনা। দেওয়ালে দেওয়ালে স্পর্ধিত স্লোগান "চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান।" কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের পকেটে পকেটে রেড বুক। মাঝরাতে গৃহস্থের দরজায় কড়া নাড়া – কখনো ছেলের খোঁজে পুলিশ – কখনো বা আন্ডার গ্রাউন্ডে থাকা ছেলের বন্ধু। আতঙ্কিত বাবা-মায়েরা, প্রতিদিনই লাশ পড়ছে – কখনো শ্রেণী শত্রু ছাপোষা পুলিশ কিংবা বড় বাজারের ব্যবসায়ী, কখনো পুলিশের গুলিতে কোন মেধাবী ছাত্র নেতা... স্কুল কলেজে বোমা – বুর্জোয়া শিক্ষা – বুর্জোয়া ধ্বংস যজ্ঞে যুবশক্তি আত্মনিবেদনের মহোৎসব।

বড় রাস্তার ধারে বসাকপাড়া। এই গলিতে প্রায় পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন ঘর মধ্যবিত্তের ও নিম্ন মধ্যবিত্তের বাস। পাড়ার ঠিক মাঝখানে সুবোধ বসাকের বাড়ি। তাঁরই পিতামহের নামে গলির রাস্তাটার নাম দীনু বসাক লেন। সুবোধ বসাক, বংশের একমাত্র কৃতি পুরুষ, এখানে থাকেন। অন্য শরিকরা কেউ কলকাতায় কেউ দেরাদুনে কেউ বা অন্য রাজ্যে। সুবোধ বসাক এক সময়ে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। অনেক বড় বড় জেলাস্তরের বা রাজ্যস্তরের নেতা, অনেক মন্ত্রী

মাঝেমাঝেই আসতেন তাঁর বাড়িতে। অনেকটা অঞ্চল জুড়ে তাঁর দাপট ও জনপ্রিয়তা। দু'টো পাড়ার মধ্যে ফুটবল খেলা নিয়ে মারপিট হলে পুলিশ যখন ছেলেদের ধরে নিয়ে যায়, তাদের বাবা-মায়েরা তাঁর কাছে আসেন – তিনি থানায় গিয়ে ছেলেদের ছাড়িয়ে আনেন।

ইদানিং বসাক পাড়াতেও সময়ের ছাপ পড়েছে। পাড়ার দু'টো দেওয়ালে রাতের অন্ধকারে কে বা কারা লিখেছে, "বুর্জোয়াদের দালালরা সাবধান।" সুবোধ বসাকের দেওয়ালে লেখা হয়েছে, "চীনের চেয়ারম্যান..." সবাই জানে এ কাজ মিত্রদের বাড়ির মেজো ছেলে বিদ্যুতের, কিন্তু মুখে কেউ কিছু বলে না, শুধু ফিসফাস। বিদ্যুৎ শুধু এ পাড়ার মধ্যেই নয়, পুরো অঞ্চলের মধ্যেই সেরা মেধাবী ছেলে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এস. সি. পড়ে। কিছুদিন হল প্রায়ই তিন-চারদিন সে বাড়ি থাকেনা। গভীর রাতে ফেরে। বাবা-মা নেই, দাদা বৌদির সংসারে বাস। সুবোধ বাবু একদিন বিদ্যুতের দাদা বিভাসকে বলেছিলেন, "বিভাস ভাইকে একটু বোঝাও, দেখছো তো চারপাশে যা সব হচ্ছে, ভালো ভালো মেধাবী ছেলেগুলো অকালে মরছে... বিভাস মিনমিনে স্বরে বলেছিল, "বোঝাই তো, কিন্তু ওর সঙ্গে তর্কে পারিনা।"

কিছুদিন পরেই স্টেশনের কাছে একজন পুলিশ অফিসারের গুলিবিদ্ধ দেহ পড়ে থাকতে দেখা গেল। রেডিওতে ও খবরের কাগজে খবরটা প্রকাশ হল। দু'একজন নিরীহ ছেলেকে ধরার জন্য সুবোধ বাবুকে থানায় যেতে হল তাদের ছাড়াতে। সুবোধ

বাবুর কথায় তারা মুচলেকা দিল থানায় বসে।

সেদিন ঠান্ডাটা একটু বেশিই পড়েছে। সন্ধ্যায় বসাক পাড়ার গলিতে তিনটে লাইটপোস্টে মিনমিনে তিনটে বাল্ব জ্বলছে – ফলে আলো অপেক্ষা আঁধারই বেশি। গলির মোড়ের বড় রাস্তায় একটা পুলিশের জিপ এসে থামল। ছিদাম কেরোসিন কিনে ফিরছিল। সে এসে সুবোধ বাবুকে খবর দিলো – পাড়ায় পুলিশ ঢুকছে। লুঙ্গিটা খুলে প্যান্ট শার্ট পড়ে সুবোধ বাবু বেরিয়ে গেলেন। বিদ্যুতের বাড়িতে পুলিশ ঢুকেছে – থানার বড়বাবু ও আরো তিনজন কন্সটেবল।

বড়বাবুকে সুবোধ বাবু বললেন, “আরে বড়বাবু আপনাকে আসতে হোল, কি ব্যাপার!” বড়বাবু চারপাশে সন্ধানী দৃষ্টি জারি রেখে বললেন, “ব্যাপার তো জানেনই যা হচ্ছে... এখন এই মহাপুরুষের খোঁজে আসা।”

বিদ্যুতের দাদা দোকানে গেছিল – ঘরে শুধু তার স্ত্রী ও একটা বাচ্চা মেয়ে। সুবোধ বসাক পাশের বাড়ির নিমাইকে পাঠালেন বিদ্যুতের দাদাকে তাড়াতাড়ি ডেকে নিয়ে আসার জন্য। সে এলো, পুলিশের ধমকের উত্তরে জানাল, “আজ চারদিন ধরে বিদ্যুৎ বাড়ি আসেনি।”

বড়বাবু বেরিয়ে এলেন সঙ্গে সুবোধ বাবু ও অন্য পুলিশরা। বড়বাবু সুবোধ বাবুকে ফিসফিস করে বললেন, “আমার কাছে কিন্তু পাকা খবর আছে যে বিদ্যুৎ পাড়ায় ঢুকেছে। দু'একটা বাড়িতে একটু সার্চ করে দেখা যাবে? এখানে আপনি আছেন তাই জিজ্ঞাসা করছি। অন্য জায়গায় হলে...”

কথাটা শেষ করতে না দিয়ে সুবোধ বাবু বললেন, “হ্যাঁ নিশ্চয়ই, দু’একটা কেন সবকটা বাড়িতেই দেখতে হবে। আমি সঙ্গে আছি, চলুন। এই উৎপাত পাড়ায় ঢুকেছে যখন, গোটা পাড়াটাকেই নষ্ট করবে। তা তো হতে দেওয়া যায় না।”

তারপর পুলিশ নিয়ে বসাক পাড়ার প্রত্যেকটা ঘরে ঢুকে, সব ঘরগুলো খুঁজে খুঁজে দেখলেন সুবোধ বাবু ও বড় বাবু। সমীর রায়ের কুড়ি বছরের ছেলে অলকের দিকে বড়বাবু একটু সন্দেহের চোখে তাকালেন।

সুবোধ বাবু বললেন, “ও খুব ভালো ছেলে, বি. এ. পড়ছে, রাজনীতি করে না।” বড় বাবু বললেন, “সুবোধ বাবু, ভালো জমিতেই আগাছা আগে জন্মায়। গোটা রাজ্য জুড়ে দেখছেন তো, ভালো ছেলেগুলোই দাপিয়ে বেড়াচ্ছে – প্রত্যেকটাই ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট। কেউ কিন্তু ধান্দাবাজ নয়।”

গোটা পাড়াটা সার্চ করা হয়ে গেলে, সুবোধবাবু বললেন, “আসুন বড়বাবু, আমার পাড়ায় এলেন, এক কাপ চা খেয়ে যান অন্তত।” একে পুলিশ তার ওপর সুবোধ বাবু সঙ্গে আছেন... কেউ কিছু মুখে বলতে না পারলেও, মনে মনে সবাই ক্ষুব্ধ হলো সুবোধ বসাকের ওপর। লোকটার ওপর তাদের শ্রদ্ধার আসন গেল টলে।

পাড়ার মহিলারা মনে মনে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করলো – বিদ্যুৎ যেন পুলিশের হাতে ধরা না পড়ে। চা করছিলেন সুবোধ বাবুর স্ত্রী মিনতী দেবী। বসার ঘর থেকেই দেখা যায় একটু লম্বা ধরনের ছোট রান্না ঘরের সামনে তোলা উনুন,

রুটি তরকারির সব সরঞ্জাম রান্নাঘরের ভেতরে দরজার কাছে – যাতে বারে বারে রান্না ঘরে ঢুকতে না হয়। বড় বাবু বললেন, "আপনাদের রাতের খাবার তাড়াতাড়িই হয়।" সুবোধবাবু বললেন, "আজ একটু বেশি তাড়াতাড়ি হচ্ছে। আসলে আমার বড় শালার মেয়ের বিয়ের পাকা দেখা কাল, আমি যেতে পারব না, তবে ওর ভাইপো আসবে ওকে নিয়ে যেতে – তাই তাড়াতাড়ি বানিয়ে রাখছে।"

চায়ে চুমুক দিতে দিতে সুবোধ বাবু আবার বললেন, "জানেন বড়বাবু, রাস্কেলটা আমার ঘরের দেয়ালে 'চীনের চেয়ারম্যান' লিখেছে।" চা শেষ করে বড়বাবু উঠে দাঁড়ালেন। সুবোধবাবু আশ্বাস দেবার ভঙ্গীতে বললেন, "আপনি চিন্তা করবেন না, আমার কাছে আপনাদের থানার ফোন নাম্বার আছে। যখনই যত রাতেই ব্যাটা ঢুকবে, আমি নিজে আপনাকে জানিয়ে দেব।" বলতে বলতে সুবোধ বাবু গলির মোড় পর্যন্ত বড়বাবুর সঙ্গে গেলেন।

পুলিশের গাড়ি থানায় ফিরে গেল। সুবোধ বাবু ঘরে আসার সময় বিদ্যুতের দাদা বিভাসকে ডেকে নিজের ঘরে আনলেন। বিভাসের ভালো লাগছিল না। এই লোকটাকে গোটা পাড়ার লোক সম্মান শ্রদ্ধা করে, তার এই চরিত্র – ছিঃ... এসব কথা যদিও সে মনে মনে ভাবছিল, মুখে কিছুই বলেনি। ঘরে ঢুকে সুবোধ বাবু দরজা বন্ধ করলেন। তারপর বিভাসকে বললেন, "আমাদের রান্না ঘরে যাও।" কথাটা ঠিক বুঝতে পারল না বিভাস। সে বলল, "মানে?" সুবোধ বাবু প্রায় ধমকের সুরে

বললেন, "রান্নাঘরে, আমাদের রান্নাঘরে যাও।"

বিভাস রান্না ঘরে ঢুকেই চমকে উঠলো, এক কোনে ভাই দাঁড়িয়ে আছে, রান্নাঘরে আলো না থাকায়, বসার ঘরের আলোর আভায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। ঘর থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এসে, সুবোধ বাবুর সামনে দাঁড়ালো সে, মুখ দিয়ে কথা বের হচ্ছিল না। খুব অস্ফুট স্বরে সে বলল, "ও এখানে ছিল!"

সুবোধ বাবু বললেন, "পুলিশের কাছে পাকা খবর থাকে। জেনে রাখো, গভীর রাতে পুলিশ আবার আসবে। তোমার কোথায় কোন আত্মীয় আছে, পুলিশ সব জানে। সেখানেও যাবে। তাই তোমার কোন আত্মীয়র বাড়িতেও ওকে পাঠানো যাবে না। বর্ধমানে আমার এক দিদির বাড়িতে পাঠিয়ে দিচ্ছি – তোমার বৌদির... আই মিন আমার ওয়াইফের সঙ্গে। তুমি একটা শাড়িতে মুড়ে, ওর দু'টো জামা প্যান্ট দিয়ে যাও।"

বিভাস চুপচাপ মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে ছিল। সুবোধ বাবু আবার ধমকের সুরেই বললেন, "কি হলো কি, কি বললাম বুঝতে পারোনি?" বিভাস ধীরে ধীরে মুখ তুলল, তার দু'চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়তে লাগল। সুবোধ বসাক দাঁতে দাঁত ঘষটে উচ্চারণ করলেন, "ইডিয়ট!" ■

প্রকাশিত সংখ্যা - ২০২২

https://online.fliphtml5.com/osgiu/ialo

https://online.fliphtml5.com/osgiu/eusb

https://online.fliphtml5.com/osgiu/tath

https://online.fliphtml5.com/osgiu/zkwb

https://online.fliphtml5.com/osgiu/lnps

https://online.fliphtml5.com/osgiu/gqaz/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/noyb

https://online.fliphtml5.com/osgiu/oomz/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/eoat/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/ubpb/

পাঠকদের সুবিধার্থে নিঃশুল্ক বাংলা অনলাইন সাহিত্য পত্রিকা **'গুঞ্জন'এর ২০২২ এ প্রকাশিত সব সংখ্যাগুলির ই-লিঙ্ক পুনরায় দেওয়া হল।**

সবিনয় নিবেদন

'গুঞ্জন' কেমন লাগল তা অবশ্যই আমাদের জানাবেন। আর আপনার লেখা 'গুঞ্জন'-এ দেখতে হলে, আপনার সবচেয়ে সেরা (আপনার বিচার অনুযায়ী) এবং অপ্রকাশিত লেখাটি আমাদের 'ই-মেল'-এ (contactpandulipi@gmail.com) পাঠিয়ে দিন (MS Words + PDF দু'ট 'ফরম্যাট'-ই চাই)। সঙ্গে আপনার একটি 'পাসপোর্ট সাইজ'-এর ছবিও অবশ্যই থাকা চাই – সাইজঃ ৩৫ mm (চওড়া) X ৪৫ mm (উচ্চতা); রিসল্যুশনঃ 300 DPI হওয়া চাই। আর Facebook এর **'পাণ্ডুলিপি (গল্প, কবিতা, গান, গদ্য ও নাটকের আসর)'** গোষ্ঠীতে অবশ্যই আপনার নিয়মিত উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়। তবে লেখা অনুমোদনের ব্যাপারে বিচারক মণ্ডলীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

বি.দ্র.: ডিসেম্বর ২০২২ সংখ্যার লেখা পাঠানোর শেষ তারিখঃ ১৫ই নভেম্বর, ২০২২

ছুটি

অনির্বাণ বিশ্বাস

অহনা আজ একটু সকাল সকাল তার মালিকের বাড়ির কাছাকাছি চলে এসেছে। তার হাতে একটা বাক্স – আর তাতে আছে তার তৈরি করা কেক। সে আজ তার মালিককে সারপ্রাইজ দেবে বলে বেশ উৎসাহের সঙ্গে একটু তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চলেছে। অহনা মাস তিনেক হল একজন অসুস্থ বৃদ্ধকে দেখাশোনার কাজ পেয়েছে। তাঁর বাড়িতে সবাই আছে, কিন্তু ঐ যা হয় আর কি! সবাই যে যার নিজের জগতে মগ্ন।

মাঝে মধ্যে ছেলের বউ এসে তাদের বাড়ির সবাইকে মাইনে দেবার অজুহাতে চেকে সাইন করিয়ে নিয়ে যায়। ঐ তখনই তাকে দেখা যায়। বাকি কাজ অহনা ছাড়াও অন্য চাকর-বাকরেরাই করে। সে রোজ বিকেলে তাঁকে গল্পের বই পড়িয়ে শোনায়। এই কিছুদিনের মধ্যেই সে তাঁর খুবই কাছের মানুষ হয়ে গেছে।

গতকাল সে যখন গল্পের বই পড়ছিল, তখন মালিককে অন্যমনস্ক দেখে অহনা একটু ইতস্তত করে তার কারণ জিজ্ঞেস করেছিল। বৃদ্ধের চোখের কোণায় একবিন্দু জলের কণা দেখে সে অবাক হয়ে গেছিল। তিনি একটু হেসে বলেছিলেন, “কাল আর একটা বছর আরও মৃত্যুর দিকে

এগিয়ে যাবো। তোমার গিন্নিমা থাকার সময়ে আমাকে কতই না যত্ন করে খাওয়াতো। বিকেলে কেক কাটাও হতো। সেও ফাঁকি দিয়ে চলে গেল, আর সবকিছুই কেমন যেন অন্যরকম...”- বলতে বলতে তাঁর গলাটা বুঁজে এসেছিল। অহনার ভারি কষ্ট হয়েছিল। সে বই রেখে উঠে তাঁর পাশে বসে চোখ মুছিয়ে দিয়েছিল।

বৃদ্ধ একটু হেসে বলেছিলেন, “দেখো, আমার সব থেকেও আমি রিক্ত। কাউকে আমি দোষ দিই না। মধ্যাহ্নের তেজ আমি হারিয়ে শেষবেলায় এসে পৌঁছেছি। আমার যা কিছু দেবার সবই যে হারিয়ে আজ নিঃস্ব। আমার কি-ই বা প্রয়োজন! তুমিই এখন আমার আপনজন -সুখ-দুঃখের সাথী।”

অহনা কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগে ওনার ছেলে-বউমা এসে ঘরে ঢুকে তাকে বাইরে চলে যেতে বলে। সে বাইরে বেরিয়ে এসে ভেতরে চিৎকার শুনতে পাচ্ছিল। কিছুক্ষণ পরে তারা বেরিয়ে এলে বৃদ্ধর শরীরটা খারাপ লাগলে সে তাঁকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে তাঁর ডাক্তারকে ফোন করে। ডাক্তারবাবু তাকে একটা ওষুধ দিতে বলেন। সে সেটা খাওয়ালে তিনি কিছুটা সুস্থ বোধ করেন। আবার ছেলের বউ এসে ঘরে ঢুকে তাকে তাড়াতাড়ি চলে যেতে বলে। অনিচ্ছাকৃতভাবেই তাকে চলে যেতে হয়।

আজকে সে বাড়িতে ঢুকতেই ডাইনিং রুমে একজন অচেনা ব্যক্তিকে বসে থাকতে দেখে। বাড়ির অন্য

লোকজনের সঙ্গে তার একটু বচসা হচ্ছিল। সে সবাইকে পাশ কাটিয়ে তার মালিকের ঘরে ঢোকে। সে ঘরে ঢুকেই আবেগের সঙ্গে বলে, “হ্যাপ্পী বার্থডে টু...” তার গলাটা কেঁপে যায়। হাত থেকে বাক্সটা পড়েই যাচ্ছিল, কিন্তু সে কোনোভাবে তা সামলে নেয়। সে দেখে খাটের উপরে শুয়ে আছেন তার মালিক। আর তাঁর সারা গায়ে ফুলের মালা ও চোখে তুলসীপাতা। মুখে একটা অব্যক্ত কষ্টের ছাপ। তাঁর সারা শরীর যেন কাঁপতে থাকে। সে খাটটা ধরে কোনোমতে দাঁড়িয়ে থাকে। তাকে ঢুকতে দেখে বাড়ির সবচেয়ে বৃদ্ধ চাকরটা চোখের জল মুছে, বলে ওঠে, “কাল রাতে বাবু আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন।” এ-ই বলে হাউ মাউ করে সে কাঁদতে থাকল। অহনারও তখন চোখের বাঁধ ভেঙেছে।

বাইরে তখন চিৎকারের মাত্রাটা ভেতরের শোককে ছাপিয়ে গেছে। সম্পত্তি ভাগাভাগি নিয়ে সবাই নিজেদের সদ্য মৃত বাবাকে দোষারোপ করে চলেছে। অহনা আর সহ্য করতে পারছিল না। তার যেন চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করছিল, “তোমরা কি আদৌ মানুষ?”

এমন সময় বাইরে থেকে তার নাম ধরে কে যেন ডাকল। সে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাইরে গিয়ে দাঁড়ালে সেই ভদ্রলোক তাকে কাছে আসতে বললেন। সে একটু অবাক হয়ে তাকালে, তিনি ঈশারায় তাকে ডেকে এক জায়গায় সই করতে বলেন। সে ইতস্তত করে সই করে, কি কারণ

জিজ্ঞেস করাতে তিনি বলেন, "তোমার নামে কিছু টাকা উনি আমায় আগেই দিয়ে গেছিলেন। আমারই একটু দেরি হয়ে গেল। এখানে একটা সই করো। বাদবাকি ফরমালিটি আমি করে তোমার কাছে সেটা পাঠিয়ে দেবো।"

অহনা একটু বিরক্ত হয়ে বলল, "আমার কিছু চাইনা। আপনি..." কথাটা শেষ করার আগেই উনি বললেন, "দেখো মা, আমার কাজ আমি করব। তারপরে টাকা পাবার পরে তোমার যা ইচ্ছে কোরো।"

বৃদ্ধের ছেলের বউ মুখ বেঁকিয়ে বলল, "ভালোই তো কচি বয়সে বাবার মাথাটা চিবিয়ে খেয়েছিলে। এই ক'দিন এসেই এতগুলো টাকা হাতিয়ে নিলে! তোমার কেরামতি আছে বলতে হবে!"

অহনার দুঃখে-অপমানে চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। সে যাকে বাবার মতো ভালোবাসতো, তার সঙ্গে এরকম নোংরা মন্তব্য শুনতে হবে সে ভাবতে পারছিল না।

সে বৃদ্ধর ঘরের দিকে যেতে গেলে তার বউমা আবারও বলে ওঠে। "ওদিকে আর যাবার কি দরকার! যার কাছ থেকে পাবার ছিলো, সেই তো আর নেই। এবার তোমার ছুটি। আর এ মুখো কোনোদিন হোয়োনা।"

অহনা নীরবে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি থেকে দৌড়ে বেড়িয়ে গেল। কিছুটা দৌঁড়ে এসে একটা ফাঁকা জায়গায় সে চিৎকার করে কেঁদে উঠল... ■